ইনকিলাব
তারিখ 12 JUL 2005
পৃষ্ঠা ২৪ ১

মাদ্রাসা শিক্ষা অতি জরুরী কেন

মাওলানা আব্দুল হক চৌধুরী

॥ এক ॥

আল্লাহ তায়া'লা মানুষকে অজ্ঞাত বিষয়বস্তু শিখিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর অনুকরণ সহজ করণের জন্য জানাকে অপরিহার্য করেছেন। জানার আবশ্যকতাকে সাহাবায়ে কেরাম সমাজে বাস্তবায়িত করে গেছেন। আজ পর্যন্ত তার প্রসার পরিচালনা চলছে।

এরই ধারাবাহিকতায় আল্লাহর মেহেরবানীতে বাংলাদেশে শিক্ষিতের হার দিন দিন বাড়ছে, তবে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রথমতঃ দু'ভাগে বিভক্ত, সাধারণ শিক্ষা ও মাদ্রাসা শিক্ষা। সাধারণ শিক্ষার প্রাথমিক স্তর হতে আরম্ভ করে উচ্চ শিক্ষা পর্যন্ত গ্রাম, ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলায় জেলায় শিক্ষার যেভাবে ব্যবস্থা রয়েছে, সে হারে মাদ্রাসা শিক্ষার ব্যবস্থাত নাইই, বরং অনেক ক্ষেত্রে মাদ্রাসা শিক্ষার অস্তিত্বও হয়ত নেই। মাদ্রাসা শিক্ষা অবহেলিত শিক্ষা, কোন কোন ক্ষেত্রে এ শিক্ষার সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় মানও নেই। শুধু এই শিক্ষায় শিক্ষিত লোকের সাধারণতঃ চাকরিও নেই, যতক্ষণ পর্যন্ত সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত না হয়। তখন সাধারণ শিক্ষার প্রভাবে চাকরি হয়ত মিলতে পারে। সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ব্যবস্থাও কম, মান-সম্মান প্রতিভা, প্রতিপত্তিও কম- যে কারণে অভিভাবকগণ নিজ ছেলে-মেয়েদের মাদ্রাসায় ভর্তি করতে চান না। তাই মাদ্রাসা শিক্ষার ছাত্রের সংখ্যা সাধারণ শিক্ষার ছাত্রের তুলনায় ৫-৭% হবে, এর বেশী হবে না। মাদ্রাসার দাখিল, আলিম, ফাজিল ও কামিল মিলে ছাত্রের সংখ্যা লাখ বা কিছু বেশী হতে পারে। যেখানে মাধ্যমিক এক এক শিক্ষা বোর্ডে দুই লক্ষাধিক ছাত্রের সংখ্যা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ পায়। ছয় বোর্ডের ছাত্র সংখ্যা একত্রিত করলে ১২-১৩ লাখ ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা দাঁড়াবে। সংখ্যার পার্থক্য বুঝা কঠিন হবে না। মাদ্রাসা শিক্ষার ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বাড়াতে হলে প্রাথমিক শিক্ষার মত ইবতেদায়ী শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষার কার্যক্রম অনুযায়ী ইবতেদায়ী শিক্ষার জন্য গম, চাউল, উপবৃত্তি ইত্যাদি উপকরণও সমপরিমাণ দিতে হবে। ইবতেদায়ী মাদ্রাসায় ছাত্র-ছাত্রী যত বেশী হবে, দাখিল, আলিম, ফাজিল ও কামিল স্তরেও ছাত্র-ছাত্রী তত বেশী হবে।

যদি প্রতি ইউনিয়নে ১০টি করে ওয়ার্ড হয়, প্রতি ওয়ার্ডে ২টি করে ইবতেদায়ী মাদ্রাসা হয় এবং প্রত্যেক মাদ্রাসায় কমপক্ষে দু'শ' ছাত্র-ছাত্রী পড়তে পারে, তবে প্রতি ইউনিয়ন হতে বছরে চার হাজার ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষালাভ করতে পারে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মত ইবতেদায়ী মাদ্রাসায় যদি বিনা খরচে পড়ার সুযোগ পায়, সঙ্গে গম, চাউল ইত্যাদি উৎসাহব্যঞ্জক উপকরণও পায়, তাহলে সকলেই মাদ্রাসায় পড়ানোর সুযোগ নেবে। এই শিক্ষার সুযোগে ছাত্র-ছাত্রীরা প্রথম হতেই ইসলামী মানসিক অবস্থায় গড়ে উঠবে, আচার-আচরণ, আদব-কায়দা, সৎ গুণাবলী ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যও অর্জন করতে সক্ষম হবে যা জীবন গড়ার বড় উপকরণ হবে। তাই সর্বস্তরে শিক্ষার প্রসার করতে হলে মাদ্রাসা শিক্ষা খাতে পূর্ণ সরকারী সহযোগিতা প্রয়োজন।

সরকারী মাদ্রাসা নেই বললেই চলে। বাংলাদেশ সরকার একটি মহুতফাবিয়া আলিয়া মাদ্রাসা, বগুড়াকে জাতীয়করণ করেছে। আর কোন মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা বা জাতীয়করণ করা হয় নাই। সিলেট সরকারী আলিয়া মাদ্রাসা ১৯১৩ সনে তৎকালীন আসাম সরকার প্রতিষ্ঠা করেছিল। ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসা কলিকাতা থেকে ১৯৪৭ সনে গোপনে ঢাকায় স্থানান্তরিত করা হয়। তাই বলা যায় যে, পূর্ব পাকিস্তান বা বাংলাদেশ সরকার কোন মাদ্রাসাই প্রতিষ্ঠা করেনি। অথচ বেসরকারীভাবে তো আছেই, সরকারীভাবেও প্রতি উপজেলায় ও জেলায় হাইস্কুল, কলেজসহ সরকারী প্রতিষ্ঠান রয়েছে অনেক, সরকারী সাহায্যে কমপক্ষে ১৫-২০টা বিশ্ববিদ্যালয়ও পরিচালিত হচ্ছে।

মাদ্রাসা শিক্ষাকে অবহেলা করার কারণে এ শিক্ষার মানোন্নয়ন, সম্প্রসারণেও সর্ব সাধারণের কাছে গ্রহণীয় করতে যেমন সরকারী কোন উদ্যোগ নেই, তেমনি আঞ্চলিক বা জাতীয় পত্র-পত্রিকায়, রাজনৈতিক মঞ্চে বা সংসদে মন্ত্রী সভায়ও তেমন কোন আলোচনা নেই। ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত, সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় জীবনে যে নিয়ম নীতি আদর্শ বা বিধি বিধান মেনে চলার আবশ্যকতা রয়েছে, তার প্রতি কোন আন্তরিকতা না থাকার কারণে বা তা হতে নিজেকে সরিয়ে রাখা দরকার ভেবে স্বাধীন ও নীতি বহির্ভূতভাবে জীবনযাপন করার অভিপ্রায় হিসাবে মাদ্রাসা শিক্ষার প্রতি গুরুত্বও তেমন দেয়া হচ্ছে না। এর কারণ হল মাদ্রাসা শিক্ষা বেশীভাবে প্রচলিত হলে সামাজিক জীবনে ইসলামী মূল্যবোধের অনুকরণ জরুরী হয়ে যাবে এবং অনেক ক্ষেত্রে বেহায়ার মত চলাফেরা লজ্জাজনক স্বীকৃতি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায়, প্রশাসনিক পরিচালনায় সম্ভবতঃ মানসিক সংকোচতার কারণে '৮৫ সনে দাখিলকে মেট্রিক ও '৮৭ সনে আলিমকে আইএ সমমান ঘোষণা করতঃ ভুল হয়েছে মনে করে '৮৯ সন হতে ফাজিলকে ও '৯১ সন হতে কামিলকে যথাক্রমে বিএ ও এমএ-এর সমমান ঘোষণা করার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকা সত্ত্বেও অদ্যাবধি সে মান দেয়া হয় নি। মাদ্রাসা শিক্ষার প্রতি সামান্যতম সহানুভূতি থাকলে ফাজিল কামিলকেও সময় মত সমমানের ডিগ্রী দেয়া হত। কিন্তু পরিতাপের বিষয়- একটি শিক্ষিত জনগোষ্ঠীকে অবহেলিত রাখা তাদের জীবনের উন্নয়নে বাধাদান কলাকৌশলে শিক্ষার প্রতিযোগিতায় যাতে না আসতে পারে আইনগতভাবে যাতে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে না পারে, চাকরির ক্ষেত্রে সমমান প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করতে পারে; সেজন্য পাওয়ার অধিকার খর্ব করার জন্য প্রশাসনিক শক্তি সমমানের ডিগ্রী প্রদানে বিরত রয়েছে।

যে শিক্ষার ডিগ্রীই নেই, সেই শিক্ষার কি মান হতে পারে। এটা একটি অদ্ভুত ব্যাপার মনে হয়। দুনিয়ার কোথাও পাওয়া যাবে না। শিক্ষা আছে, বিভাগ আছে, কর্তৃপক্ষ আছে প্রতিষ্ঠানও আছে, সরকার সামান্য হলেও খরচ করছে, পরীক্ষা নিচ্ছে, কিন্তু এই শিক্ষার ডিগ্রী নেই। এটা কিভাবে মেনে নেয়া যায়।

যদি সাধারণ শিক্ষার সমমানে ফাজিল বা কামিলের ডিগ্রীর মান হত, তাহলে অভিভাবকগণ নিজ নিজ ছেলেমেয়েদের মাদ্রাসায় ভর্তি করতেন এবং শিক্ষিতের হার দিন দিন বাড়তে থাকত, সঙ্গে সঙ্গে দেশের উন্নয়নও প্রভাবিত হত। আমি একজন লেখক হিসেবে মাদ্রাসা শিক্ষাকে সাধারণ শিক্ষার সমমান প্রদানের জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে সবিনয় অনুরোধ জানাচ্ছি।

যদিও মনে করি যে, সরকার বা জনগণ মাদ্রাসা শিক্ষার প্রতি আগ্রহী, তবে কি মাদ্রাসা শিক্ষা সম্প্রসারণ সম্ভব হবে। তার কোন পথ ও পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়নি। এসব প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য সাধারণ শিক্ষিত পাওয়া গেলেও সেই পরিমাণ মাদ্রাসা শিক্ষিত তো পাওয়া যাওয়ার কথা নয়।

এই কথা সত্য, তবে সদিচ্ছা থাকলে উপায় উদ্ভাবন সম্ভব হবে হতে পারে। ইউনিয়ন কাউন্সিলের নির্বাচনে মেম্বার ও চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী এলাকার উন্নয়নে দাবী করে নিজ নিজ পদে সফলতার জন্য যদি দুই, তিন, চার, পাঁচ লক্ষ টাকা পর্যন্ত খরচ করতে পারে- তবে এলাকার শিক্ষা উন্নয়নের জন্য তারা নিম্নোক্ত উপায়ে খরচ করতে পারবে বলে আশা করা দুরাশা নয়।

প্রথমতঃ সরকারীভাবে দেশের প্রত্যেক ইউনিয়নের চেয়ারম্যানদের প্রাথমিক শিক্ষাস্তরের সমপরিমাণ ইবতেদায়ী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করণের নির্দেশ দেয়া দরকার। তারা ইমাম সাহেবদের ও বিত্তবানদের সাহায্যে ও ইউনিয়নের খরচে উপরে টিন দিয়ে বাঁশ বেতের ঘর তৈরী করবেন। জায়গায়ও তারাই ব্যবস্থা করবেন। পরে সম্ভব হলে আস্তে আস্তে পাকা করণের চেষ্টা করবেন। এতে জনগণ স্বাভাবিকভাবে সহযোগিতা করবে, সরকারী নির্দেশের অনুকরণেও আরও আগ্রহী হবে এবং প্রত্যেক অভিভাবককে ছেলে-মেয়েদের কমপক্ষে এক একজন স্কুল ও মাদ্রাসায় ভর্তি করণের নির্দেশ দেয়া হবে। যাদের বয়স ৫-এর উর্ধ্বে হবে এসব মাদ্রাসায় শিক্ষাদানের জন্য আলিম, ফাজিল ও কামিল ডিগ্রীধারীকে নিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে আইএ ও বিএ ডিগ্রীধারীকেও নিয়োগ দেয়ার দরকার হবে।